KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 02, Issue :01, (January - June) 2025
Published On 28th March 2025

ভারতীয় ইতিহাসের এক অনন্য ভিত্তি নির্মাতা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

স্বপন দাস
প্রাক্তনী, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রণেতা হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি সাফল্যের সঙ্গে নব উদ্ভাবিত প্রত্নতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের (science of archaeology) ওপর শিক্ষা লাভ ও বিষয়টি চর্চা করেন। ভারতীয়দের প্রথমদিককার কয়েকজনের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি মানুষের অগ্রগতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ভারতীয়দের দ্বারা দেশজ প্রত্ন-নিদর্শন সম্পর্কিত বিদ্যাচর্চার ভিত্তি স্থাপন করেন রাজেন্দ্রলাল। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কঠোর ও নিরলস শ্রম দেশ-বিদেশ থেকে তাঁর জন্য সম্মান বয়ে আনতে শুরু করে। উপনিবেশিক যুগের প্রাথমিককালের ভারতীয়দের মধ্যে পান্ডিত্য এবং শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে তিনি ইউরোপে সম্মানিত হন। তিনি ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডের 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি'র সদস্যপদ লাভ করেন। ঊনবিংশ শতকের জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্ম, জীবনবোধ এবং মনুষ্যত্বের আদর্শে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব হিসেবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁর জীবনের কর্ম ও সাধনা ভারতবাসীর প্রতি যে মহৎ অবদান রেখে গেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

সূচক শব্দ - রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রত্নতাত্ত্বিক, এশিয়াটিক সোসাইটি, শিলালিপি, ঊনবিংশ শতক, ঐতিহাসিক

ঊনবিংশ শতক আমাদের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে সেযুগের নানান উল্লেখযোগ্য ঘটনার সমাহারে। শুধু তাই নয় সেইসমস্ত ঘটনার সাথে যুক্তবহু মহান প্রথিতযশা ব্যক্তির কৃতিত্বেও। এসময় একদিকে একাগ্র সমাজ সংস্কারের উদগ্র বাসনা এবং নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের বিকাশ যেমন সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতির নানান ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তনের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল তেমনি অন্যদিকে রেনেসাঁর লক্ষণ হিসেবে মানবতাবাদ তথা মনন-চিন্তন ও পান্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বহু যুগ ধরে চলে আসা অসাড়তা, আলস্য, অন্ধকার ও সামাজিক সংকীর্নতা থেকে ভারত তথা বাংলাকে মুক্তির পথ দেখালো। ফলে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে এক বিপুল পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠল, যা এই সংকীর্ন ও সীমাবদ্ধ ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটালো। আর সাথে সাথে দৃষ্টিগোচর হল মনুষ্যত্বের একটা নতুন আদর্শের।[১] যার পরিচায়ক হিসেবে রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিনিষ্ঠা এবং বিদ্যাসাগরের হৃদয়বত্তা যেমন বহুল চর্চিত তেমনি এই পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রায় অনালোচিত এক পরিচায়ক হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ২০২২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি এই মহৎ কীর্তিমান ব্যক্তির জন্ম দ্বিশতবর্ষ পূর্ণ হল। তাঁর জ্ঞানানুশীলন তিনিশ শতকের ভারত ও বাংলায় কেবলমাত্র সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে নয়, ভারতবিদ্যা চর্চা এবং ঐতিহাসিক গবেষণার পথ অনেকটা প্রশস্ত করে দেয়। সেক্ষেত্রে তিনি একাধারে যেমন

ইতিহাসের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন তেমনি আবিষ্কৃত তথ্যের ভিত্তিতে নিজে ইতিহাস লিখেছেন। 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন'।[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উক্তির মধ্য দিয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমগ্র জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনিশ শতকে ইউরোপের জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশে ইতিহাসের আকর অনুসন্ধান করে সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ শুরু হয়েছিল। এ ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছিলো ইউরোপের জাতীয়তাবাদ আর ভারতের ক্ষেত্রে তা ছিল অনেকটা অস্পষ্ট। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় পণ্ডিতরা এদেশের ইতিহাস রচনার প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহ দেখাননি। একাজে প্রথম ব্রতী হলেন ইংরেজরা, প্রথমে শাসনের প্রয়োজনে এদেশকে জানার উদ্দেশ্যে এদেশের প্রাচীন পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে এই পথ প্রশস্ত করেছেন তাঁরা। তবে এর সবটা যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল তাও ঠিক না। অজানা একটা দেশের অতীতকে জানার জন্য তাঁরা এদেশের নানান তথ্য সংগ্রহ করেছেন, এদেশের ভাষা শিখেছেন, সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন এবং সেই নিরিখে নতুন আবিষ্কৃত তথ্যের ভিত্তিতে ভারতের ইতিহাস চর্চার সূচনা করেছেন। তিনিশ শতকে ইউরোপে দৃষ্টবাদ ও রোমান্টিকতার যুগের সূচনা হয়। ফলে তথ্য যাচাই করে বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী যে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসচর্চার পদ্ধতির প্রচলন হয়েছিল তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিত (নাথানিয়েল হ্যালহেড, এইচ টি কোলব্রুক, চার্লস উইলকিন্স, জন শোর, উইলিয়াম চেম্বার্স) রা এই পদ্ধতি ভারতে নিয়ে আসেন। এবং ভারত ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ঘটান। ইউরোপীয়দের এই ভারত ইতিহাস চর্চার কেন্দ্র ছিল এশিয়াটিক সোসাইটি। আর এই সংস্থার সাথে অতি অল্প বয়সে যুক্ত হয়েছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সেই সূত্রে তিনি ইউরোপীয় এই প্রথিতযশা পণ্ডিতদের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁদের ভাবনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। এই সময় নিত্য নতুন শিলালিপি, স্থাপত্য নিদর্শন, মূল্যবান প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কার হয়েছিল। ইউরোপীয়রা যেমন একদিকে এগুলি সংগ্রহ এবং বর্ণনা করেছে অন্যদিকে রাজেন্দ্রলাল তার পাঠোদ্ধার ও বিশ্লেষণ করে এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় বা পত্রিকায় তা প্রকাশ করেছেন। এবং নতুন আবিষ্কৃত তথ্যের সাহায্যে লিখেছেন প্রায় ১৪১ টি প্রবন্ধ এবং বহু গ্রন্থ। যেগুলি বর্তমান আধুনিক ঐতিহাসিকদের কছে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আকর গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সে যুগে রাজেন্দ্রলাল যেমন নতুন কিছু আবিষ্কার করেননি তেমনি একথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে সেসময় নতুন আবিষ্কার এবং আবিষ্কারকের মহিমা প্রকাশ পেয়েছে আলোচকদের একাগ্র অভিনিবিষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। সেক্ষেত্রে অন্যতম একজন আলোচক ও বিশ্লেষকের ভূমিকা পালন করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি নতুন আবিষ্কৃত তথ্যপুঞ্জকে ইউরোপীয় ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বিচার ও বিশ্লেষণ করতে শিখেছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক বিশ্লেষনী মানসিকতা তথ্যনিষ্ঠতা ভারতীয়দের মধ্যে ইতিহাস রচনার এক নতুন চেতনার জাগরণ ঘটিয়েছিল। তবে ইতিহাসচর্চায় রাজেন্দ্রলাল এর প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রায় আর নেই পরোক্ষ প্রভাবও আর নেই বললে চলে। তবে আকর গ্রন্থ হিসেবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বহু প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ বিশেষত সংস্কৃত পুঁথির তালিকা আজও গবেষণার কাজে ঐতিহাসিকরা ব্যবহার করে থাকেন। এবং আজও বহু ক্ষেত্রে তা ইতিহাস রচনা অন্যতম উপাদান রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারতীয়দের মধ্যে সে যুগে রাজেন্দ্রলাল এর একক প্রয়াস ও প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক গবেষণার পথ প্রস্তুতকরণে অনেকটাই সফল হয়েছে- এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।[৩]

কলকাতার পূর্ব দিকে শহরতলীর উপকণ্ঠে সুঁড়ার এক প্রাচীন মিত্র পরিবারে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ই ফেব্রুয়ারি ভূমিষ্ঠ হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।[৪] নিজের বংশপরিচয় দিতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা ছিলেন মিত্রবংশীয় বিশ্বামিত্র গোত্র সম্ভূত। কাহিনী অনুসারে বঙ্গের অধীশ্বর আদিশূর রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে কাণ্যকুব্জ (কনৌজ) থেকে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম অনুচর ছিলেন কালিদাস মিত্র। তিনি ছিলেন বিশ্বামিত্রের বংশধর এই কালিদাস মিত্রই বাংলায় মিত্র বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। রাজেন্দ্রলাল নিজ হাতে সংকলিত বংশতালিকায় নিজেকে কালিদাস মিত্রের ২৪ তম অধস্তন বংশধর বলে অভিহিত করেছেন।[৫]

রাজেন্দ্রলাল- এর পিতা জনমেঞ্জয় মিত্র ছিলেন একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁর ছয় পুত্র এক কন্যার মধ্যে তৃতীয় পুত্র ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। পাঁচ বছর বয়সে তার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। বৃহৎ পরিবারের ভার সামলাতে না পেরে জনমেঞ্জয় কলকাতায় তাঁর বিধবা বোনের কাছে রাজেন্দ্রলালকে রেখে আসেন, সেখানেই পিসীমার স্নেহে শিক্ষা জীবন শুরু করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। প্রথমে জোড়াসাঁকোর রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের বাড়িতে অবস্থিত একটি পাঠশালায় তিন বছর বাংলা ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। আট বছর বয়সে তিনি পাথুরিয়াঘাটার ক্ষেম বসুর ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দ চন্দ্র বসাকের হিন্দু ফ্রি স্কুলে ভর্তি হন এবং এই স্কুলে তিনি মেধার সাথে উত্তীর্ণ হলেন। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। মেডিক্যাল কলেজেও ছাত্র হিসেবে রাজেন্দ্রলাল অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন এবং বহু পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র লাভ করেন, যদিও বিশেষ কারণে সেখান থেকে ডিগ্রী লাভ করতে পারেননি। মেডিক্যাল কলেজে থাকাকালীন তিনি ক্যামেরণ নামে একজন ইউরোপীয় শিক্ষকের কাছে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যায়ন করেন এবং তাতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। পরে রাজেন্দ্রলাল আরও বহু ভাষা শিক্ষার প্রতি আগ্রহি হয়ে ওঠেন এবং সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, ফার্সি, জার্মান ইত্যাদি ভাষার উপর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর ২৩ বছর বয়সে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মাসিক ১০০ টাকা বেতনে এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিয়ান এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন।[৬] এই পদে তিনি প্রায় ১০ বছর বহাল ছিলেন এবং পরে আজীবন অবৈতনিক কর্মী হিসেবে এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে যুক্ত ছিলেন। শুধু তাই নয় নিজের যোগ্যতার দ্বারা এশিয়াটিক সোসাইটির কয়েকটি সভায় সভাপতিত্বও করেছিলেন। এ কর্মে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন প্রথম ভারতীয়। এশিয়াটিক সোসাইটিতে থাকাকালীন প্রাচ্য সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস চর্চার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং যার ফলশ্রুতি হল এই বিষয়ে লেখা তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সমূহ।

ভারত সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীনকাল থেকে ইতিহাস রচনায় বঞ্চিত হয়ে আসছিল এদেশ। অতীতের নানা ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকলেও তা থেকে কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাস অতীতে রচিত হয়নি, যেভাবে অন্যান্য প্রাচীন দেশে ইতিহাস লেখা হয়েছিল। ফলে ভারতের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস লেখাও সম্ভব হয়নি। ভারত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই শৃঙ্খল মোচন ঘটল ভারতে ইংরেজ আগমন এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে, মূলত ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পরে। ইংরেজদের ভারত সম্পর্কে আগ্রহ এবং ইতিহাস চর্চার প্রসার ঘটতে থাকে তবে সেক্ষেত্রে এই ভারতবিদ্যা চর্চায় নিযুক্ত পন্ডিতদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন ইউরোপীয়, একমাত্র ভারতীয় ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত এশিয়াটিক সোসাইটির ইতিহাসে- জার্নালের প্রধান লেখকদের যে তালিকা রাজেন্দ্রলাল প্রস্তুত করেন তা থেকে একথা জানা যায়। আসলে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্বে যে ইতিহাস-জিজ্ঞাসা এবং ইতিহাস-চেতনা প্রসার লাভ করল তার পিছনে একদিকে ইউরোপীয়দের ভারতবিদ্যা চর্চার প্রতি আগ্রহ এবং অন্যদিকে নতুন জাতীয়তাবোধ অনুপ্রেরণা রূপে কাজ করেছিল। এই পথে রাজেন্দ্রলাল হলেন ভারতীয়দের মধ্যে পথিকৃৎ। প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত নানান গ্রন্থাবলী এশিয়াটিক সোসাইটি তে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ‘বিবলিওথিকা ইন্ডিকা’ নামে সিরিজে প্রকাশিত হতে থাকে। এই সিরিজে প্রধানত সংস্কৃত এবং আরবী ফারসি গ্রন্থের সম্পাদনা এবং ইংরেজি অনুবাদ হতে থাকে। ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৮৮৪ সালের মধ্যে এইরূপ প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ১১১। ১৮৮৪ সালে শতবার্ষিকীর সময় এশিয়াটিক সোসাইটির ইতিহাসে বিবলিওথিকা ইন্ডিকা সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তা ছিল এইরকম- প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত মোট ১৪০ টি প্রকাশিত বা প্রকাশিতব্য গ্রন্থের মধ্যে ১১১ টি গ্রন্থ ‘বিবলিওথিকা ইন্ডিকা’ র অন্তর্গত। এর মধ্যে একদিকে আছে কিছু আরবী আইন পুস্তক, ফার্সি প্রায় সকল প্রাচীন বিখ্যাত বই এবং আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের মূল পাঠের সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদ। অন্যদিকে আছে বৈদিক সংহিতার ২৪ টি বই, তিনটি পুরান, ন্যায়

শাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ এবং অলংকার শাস্ত্র সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ।[৭] এখানে যত সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ ও সম্পাদনা হয়েছিল তার মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনা গ্রন্থের পরিমাণ ছিল সর্বাধিক।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্ব থেকে শুরু হলেও ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে এসেও ঐতিহাসিকদের হাতে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ইতিহাস লেখার জন্য তেমন কোন তথ্য ছিল না। ফলে সে যুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্কে ঐতিহাসিকরা যতটা লিপ্ত হয়েছেন তার চেয়ে তাঁদের বেশি মনোযোগ দিতে হয়েছিল ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের দিকে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র যখন ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন তখনও তার কাছে ইতিহাসের তথ্য ছিল কুয়াশার মতো অস্পষ্ট। সে সময় নানা স্থাপত্য ভাস্কর্য আবিষ্কার এবং লেখমালার পাঠোদ্ধারকে নিয়ে নানা আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়েছিল, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি স্থাপত্য ভাস্কর্যের আবিষ্কার এবং লিপির পাঠোদ্ধার করেন রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং। এইসবের মাধ্যমে ইতিহাস চর্চায় নিজেকে অভিনিবিষ্ট করলেন রাজেন্দ্রলাল। ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম রচনাগুলি প্রধানত লেখমালার পাঠোদ্ধার এবং সময় নির্ধারণ সংক্রান্ত বর্ণনা এবং বিতর্কে সমৃদ্ধ হয়েছে। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রসিডিংস-এ 'উমগা' লিপির অর্থোদ্ধার এবং ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে রাজেন্দ্রলালের ইতিহাস গবেষণার সূত্রপাত ঘটে।[৮] ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিনায়ক পালদেবের বংশ তালিকা সহ একটি তাম্রলিপি অনুবাদ করেন।[৯] এবং সেই সময় থেকে পাল রাজাদের সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন রাজেন্দ্রলাল। উজ্জয়িনীতে প্রাপ্ত দানপত্রের ইংরেজি অনুবাদ করে ১৮৫০ এ সোসাইটির প্রসিডিংস-এ প্রকাশ করেন।[১০] পরে প্রাপ্ত সংস্কৃত লিপি পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ মহম্মদপুরে প্রাপ্ত তিনটি প্রাচীন মুদ্রার পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ, গোয়ালিয়র ও এরান প্রশস্তির পাঠোদ্ধার এবং কাশ্মীরের তোরমান নামক একজন হুন রাজার কাল নির্ণয় ও ঐতিহাসিক পরিচয় নির্দেশ করতে থাকেন। শ্রীহট্ট থেকে কুড়ি মাইল দূরে ভাটেরাতে প্রাপ্ত দুটি তাম্রলিপির প্রথম পাঠোদ্ধার করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সেই সাথে রাজশাহীতে প্রাপ্ত লিপি পাঠোদ্ধার করে সেখান থেকে সেন রাজাদের যে পরিচয় পান তা নিয়ে রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 'On The Sena Rajas Of Bengal' শিরোনামে।[১১] এঁর দশ বছর পরে উক্ত প্রবন্ধের ভিত্তিতে এবং প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে আরও বিস্তারিতভাবে সেন রাজাদের বংশপরিচয়, শাসনকাল, তাদের সমাজ-ধর্ম ইত্যাদি বর্ণনা করে ২৭ পাতার আর একটি বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করেন। মুসলিম শাসনের পূর্বের বাংলাদেশের সমাজ ও ধর্মের (পাল ও সেন রাজাদের) ইতিহাস আজ প্রায় আলোকিত হলেও ঊনবিংশ শতকে তা ছিল প্রায় দুষ্প্রাপ্য। সমসাময়িককালে আবিষ্কৃত কয়েকটি শিলা লিপি, তাম্রপত্র এবং মুদ্রাই ছিল তথ্য আহরণের অবলম্বন মাত্র। অষ্টাদশ শতকে মুঙ্গেরে প্রাপ্ত পাল রাজাদের একটি তাম্রলিপির অনুবাদ করে চার্লস উইলকিন্স Asiatic Researches পত্রিকায় গোপাল, ধর্মপাল ও দেবপাল- এর কথা উল্লেখ করেন। কিছুকাল পর দিনাজপুর জেলায় প্রস্তর স্তম্ভে পাল রাজাদের যে আদেশ লিপি আবিষ্কার হয় তাও উইলকিন্স অনুবাদ করেন। বারানসীর নিকটে সারনাথে আবিষ্কৃত প্রস্তর লিপি থেকেও মহিপাল, স্থিরপাল, বসন্তপাল এবং কুমার পালের নাম পাওয়া যায়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর পূর্বে এবং সমসাময়িককালে প্রাপ্ত শিলালিপি এবং তাম্রলিপিগুলির সাহায্যে পাল রাজাদের বংশতালিকা এবং তাদের কাল নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি পাল রাজাদের যে কালানুক্রমিক বিবরণ দিয়েছেন তা ছিল খানিকটা এইরকম- ১) গোপাল- ৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ, ২) ধর্মপাল- ৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩) দেবপাল ৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪) প্রথম বিগ্রহ পাল- ৯১৫ খ্রিস্টাব্দ...।[১২] যদিও পরবর্তীকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই নির্ধারিত সময়সীমার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কোনভাবেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র দোষী নন, কারণ তৎকালীন সময়ে প্রাপ্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে এটিই ছিল প্রামাণ্য।

ঊনবিংশ শতকে বাখরগঞ্জ জেলা থেকে প্রাপ্ত কেশব সেনের তাম্রশাসন, মালদহ জেলার দেওপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত বিজয় সেনের তাম্রশাসন এবং দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলায় আরও কয়েকটি তাম্রশাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই আবিষ্কৃত লিপির তথ্যের উপর ভিত্তি করে রাজেন্দ্রলাল, সেন রাজাদের বংশ তালিকা

এবং তাদের কালসীমা নির্ণয় করেছেন। লক্ষণ সেনের সময় পর্যন্ত রাজেন্দ্রলাল প্রদত্ত সেন রাজাদের বৃত্তান্ত আধুনিক কালেও ঐতিহাসিক মহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। যদিও লক্ষ্মণ সেনের পরবর্তী সেন রাজাদের নাম এবং ক্রমপর্যায়িক সময়সীমা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। রাজেন্দ্রলাল বর্ণিত সেন রাজাদের বংশ তালিকা ছিল ঠিক এইরকম- বীর সেন → সামন্ত সেন → হেমন্ত সেন → বিজয় সেন → বল্লাল সেন → লক্ষণ সেন। এঁর পরে অশোক সেন নামে একজন রাজার নাম করেছেন। এবং মাধব সেন এবং কেশব সেনকে লক্ষণ সেন এর দুই পুত্র বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আধুনিক কালে বিশ্বরূপ সেনের একটি তাম্রশাসন আবিষ্কারের পরে এই ধারনার পরিবর্তন ঘটে। উক্ত তাম্রশাসনের ভিত্তিতে আধুনিক ঐতিহাসিকরা বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেনকে লক্ষণ সেনের দুই পুত্র বলে অভিহিত করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে, সেন রাজারা ছিলেন বৈশ্য। কিন্তু বাখরগঞ্জ ও রাজশাহীতে প্রাপ্ত কয়েকটি তাম্রশাসন এবং শিলালিপির সাহায্যে রাজেন্দ্রলাল প্রমাণ করেন যে সেন রাজারা ছিলেন ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়।[১৩]

প্রাথমিকভাবে ঊনবিংশ শতকের প্রথম পর্বে ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের আবিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু সরকারি উদ্যোগে প্রথম একাজের দায়িত্ব পড়ল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ওপর। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে ‘রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস’ ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনগুলির বিশদ বিবরণ ও প্রতিলিপি সংগ্রহ করার জন্য ভারত সরকারের কাছে আর্জি জানায়। এজন্য একটা মোটা অঙ্কের টাকাও তারা ভারত সরকারের হাতে তুলে দেয়। ফলে তৎকালীন বাংলার শাসক উইলিয়াম গ্রে প্রাচীন স্থাপত্যকর্ম উদ্ধারের জন্য পার্শ্ববর্তী রাজ্য ওড়িশাকে মনোনীত করেন এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নেতৃত্বে ওড়িশার ভুবনেশ্বর অঞ্চলে একটি অভিযানের আয়োজন করেন (১৮৬৮-১৮৬৯)। রাজেন্দ্রলাল ওড়িশার ভুবনেশ্বর ও পুরীর মন্দির, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহা স্থাপত্য, কোনারক ও অন্যান্য বহু মন্দিরের ইতিহাস আবিষ্কার, বিভিন্ন শিলালেখ এবং মূর্তির প্রতিলিপি গ্রহণ করেন। তার উৎকৃষ্টতম প্রমাণ হল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দুই খন্ডে লেখা ‘Antiquities of Orissa’ গ্রন্থটি যার প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে এবং তার ঠিক পাঁচ বছর পর ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় খন্ডটি প্রকাশিত হয়। স্থাপত্য পরিদর্শনের ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলাল বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন এখানকার মন্দির স্থাপত্যের প্রতি। ওড়িশার মন্দির স্থাপত্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দির স্থাপত্যের কথাও তুলে ধরেছেন। এইভাবে সমগ্র উত্তর ভারতের মন্দির স্থাপত্যগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন- ১) প্রাচীন ওড়িশার মন্দির স্থাপত্য, ২) কাশির বিশ্বেশ্বর ও অন্যান্য মন্দির স্থাপত্য এবং ৩) বাংলাদেশের মন্দির স্থাপত্য।[১৪]

‘Antiquities of Orissa’ গ্রন্থে রাজেন্দ্রলাল ওড়িশার মন্দির স্থাপত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে মন্দিরের বৈচীত্রহীন সহজ-সরল ও সুদৃঢ় গঠন রীতির কথা যেমন তুলে ধরেছেন তেমনই মন্দিরের বহির্গাত্র, শিখর, কলস, মন্দির অভ্যন্তরের বিগ্রহ এবং তার প্রতিষ্ঠান ভূমি, নাট মন্দির, ভোগ মন্দির, তোরণ প্রভৃতির গঠন বৈশিষ্ট্যের কথাও তিনি এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। এছাড়া কাশির বিভিন্ন মন্দিরের আকার-আয়তন এবং গঠনশৈলির বিস্তারিত বিবরণও পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। কেবলমাত্র স্থাপত্য কর্মের আবিষ্কার এবং বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থাকেননি রাজেন্দ্রলাল মিত্র। স্থাপত্যের কাল নির্ণয় এবং ভারতে স্থাপত্য শৈলির অস্তিত্বের প্রাচীনত্ব নির্ণয়েও তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলাল ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সাথে তর্কের সম্মুখীন ও হয়েছেন। এইরকম একটি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক- ইউরোপীয় পন্ডিতদেরর ধারণা ছিল; রামায়ণ-মহাভারতের যুগেও ভারতবর্ষে গৃহ নির্মাণ কৌশল অজ্ঞাত ছিল, যদিও বা গৃহ নির্মাণ হত তা মাটি বা কাঠের তৈরি। পাথর নির্মিত প্রাসাদ সে যুগে ছিল না। সুতরাং ভারতবর্ষে প্রস্তর নির্মিত স্থাপত্য কর্মের সূচনা হচ্ছে অশোকের সময় থেকে। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই মতের বিরোধিতা করে ঋক বৈদিক যুগ থেকে রামায়ণ-ভারতের যুগ পর্যন্ত নানান কাব্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই মতের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন। অশোকের পূর্বেও ভারতে স্থাপত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা ছিল- তিনি প্রথমে এই কথাটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সেক্ষেত্রে উদয়গিরির গুহাগুলি

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের বহু পূর্ববর্তী স্থাপত্য তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন, এবং ক্যানিংহামের একটি অভিমত কে কেন্দ্র করে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দ বা তার কাছাকাছি সময়ের জরাসন্ধের বৈঠক ও রাজগৃহের প্রাচীর গুলি তথা তুলে ধরেছেন।[১৫] স্থাপত্য কীর্তির আরও প্রাচীন অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল পাণিনীর ব্যাকরণে উদ্ধৃত ইষ্টক, স্তম্ভ, ভাস্কর, অট্টালিকা প্রভৃতি শব্দের কথা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই সমস্ত শব্দের বুৎপত্তি থেকে একথা বলা যায় যে- সেসময় ইট বা পাথরের গৃহ নির্মাণের রীতি প্রচলিত ছিল। এছাড়া ঋগ্বেদ এবং রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন অংশ বিশ্লেষণ করেও রাজেন্দ্রলাল এটা দেখানোর প্রয়াস করেছেন যে প্রাচীন স্থাপত্য ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অট্টালিকা, সোপান, তোরণ, শিখর প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায় তাই নিশ্চিতভাবে একথা বলা যায় যে, ঋগ্বেদ এবং রামায়ণ-মহাভারতের যুগেও পাথর বা ইট নির্মিত স্থাপত্যের অস্তিত্ব ছিল।

সেই সাথে ওড়িশার স্থাপত্য কীর্তি অবলম্বনে ওড়িশা তথা সমগ্র প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর 'ইতিহাস' নামক একটি প্রবন্ধে আলোচিত প্রাচীন ভারতের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ছিল তারই ফলশ্রুতি, আর এখানেই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কৃতিত্ব। তবে একথা বলা যায়না যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রই প্রথম এবং একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য ভাস্কর্যের ভিত্তিতে এখানকার সামাজিক এবং ধর্মীয় ইতিহাস রচনা করেছেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে ফর্গুসন এবং ক্যানিংহাম প্রমুখ এদেশের স্থাপত্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে সমাজ-ধর্ম নানান বিষয়ে মতামত প্রতিষ্ঠা করলেও তা ছিল ভ্রান্ততায় পরিপূর্ণ এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা এ দেশের সমাজ এবং ধর্ম সম্পর্কে নানান অসমিচিন উক্তিও প্রতিষ্ঠা করেছেন। সাধারণত তারা ছিলেন বিদেশি, আর তাদের কাছে পাথুরে প্রমাণটাই ছিল মূল্যবান সুতরাং এ দেশের সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোন সত্য ধারণা তখনও সৃষ্টি হয়নি। সেক্ষেত্রে প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের নিজেদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা এবং ভারতীয়দের সাথে মেলামেশার অভাব, দ্বিতীয়ত বাধা এ দেশের হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও সহমর্মিতার অভাব, তৃতীয় বাধা তারা এদেশের প্রাচীন ভাষা সম্পর্কে সঠিকভাবে তখনো অবগত হয়ে ওঠেনি, ফলে এদেশের পুরান এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ থাকা সত্বেও অনেক সময় তারা সঠিকভাবে এর পাঠোদ্ধার করে উঠতে পারেনি। এই নিরিখে রাজেন্দ্রলালকে এ কর্মে প্রথম নয় তবে অনন্য বলা যেতে পারে।

রাজেন্দ্রলাল ওড়িশার স্থাপত্যকে অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতবর্ষের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, আসবাবপত্র, বাদ্যযন্ত্র অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া এবং রথের ব্যবহার সম্পর্কে পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয় ঋগ্বেদ সংহিতা, রামায়ণ-মহাভারত, মনুসংহিতা এবং নানান পুঁথির শ্লোক ব্যখ্যা করে সেযুগের সমাজ জীবন, বর্ণব্যবস্থা, শাসন প্রণালী, অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাও বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখা চারটি প্রবন্ধে (A Picnic In Ancient India, On Human Sacrifices In Ancient India, Funeral Ceremony In Ancient India এবং An Imperical Cornonation In Ancient India) প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কর্মপ্রয়াস কেবলমাত্র জ্ঞান চর্চা এবং প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজনীতি ও সামাজিক আন্দোলনেও তাঁর কর্ম প্রয়াসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভায় ব্রিটিশ সরকারের নানান ভারত বিরোধী কাজকর্মের বিরুদ্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রাজনৈতিক মতামত একাধিকবার প্রকাশ পেয়েছে। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বয়স ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৭ বছর করা হয়, সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৫ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।[১৬] সভায় তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স ১৭ থেকে ২১ বছর হওয়ার স্বপক্ষে যে যুক্তিগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি হল- প্রথমত, এদেশে ১৭ বছর বয়সে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা কঠিন।

দ্বিতীয়ত, ১৭ বছর বয়সে ইংরেজ কিশোর ইংল্যান্ডে থেকে সহজেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং একাধিক সুযোগও পাবে কিন্তু কোন ভারতীয় পিতার পক্ষে ১৬ বছর বয়সে পুত্রকে বিলেতে পাঠানো প্রায় অসম্ভব। এই সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি দাবি করেন যাতে ইংল্যান্ডের মতোই ভারতবর্ষেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও তাঁর প্রতিবাদের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল- প্রেসিডেন্সি কলেজে ড. হর্ণলেকে অধ্যাপক নিয়োগ এবং আইন আদালতের দ্বারা সরকারের এদেশে রোমান হরফ চালানোর প্রচেষ্টা,[১৭] সেকালের ভারতীয়দের শিক্ষার প্রতি ইংরেজদের অনিহা,[১৮] ইলবার্ট বিল,[১৯] ইত্যাদি। এইভাবে একদিকে অবিচারের বিরুদ্ধে সদা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ, অন্যদিকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব_ সে যুগে রাজেন্দ্রলালকে ভারতীয় সমাজে অসামান্য প্রতিষ্ঠা দান করেছিল। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ সালে কলকাতার টাউন হলে জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র কংগ্রেসের অতিথি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। অধিবেশনের প্রথম দিনে রাজেন্দ্রলাল যে বক্তৃতাটি দেন তা ছিল এইরকম- 'We are all bound by the same political bond, and therefore we constitute one nation. I behold in this Congress the dawn of a better and a happier day for India. I look upon it as the quickening of a new life. For long, our fathers lived and we have lived as individuals only, or as families, but henceforward I hope we shall be living as a nation, united one and all to promote our welfare and the welfare of our mother country.' [২০] যার অর্থ- আমরা সবাই একই রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ, এবং তাই আমরা একটি জাতি গঠন করি। আমি এই কংগ্রেসে ভারতের জন্য আরও ভাল এবং সুখী দিনের ভোর দেখছি। আমি এটিকে একটি নতুন জীবনের গতি হিসাবে দেখি। দীর্ঘকাল ধরে, আমাদের পিতারা বেঁচে ছিলেন এবং আমরা বসবাস করেছি শুধুমাত্র ব্যক্তি হিসাবে বা পরিবার হিসাবে, কিন্তু এখন থেকে আমি আশা করি আমরা আমাদের কল্যাণ এবং আমাদের দেশের কল্যাণকে উন্নীত করার জন্য একটি জাতি হিসাবে, একতাবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকব। এই বক্তৃতাটির ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠেছে। অবশেষে ১৮৯১ সালের ২৬ শে জুলাই রবিবার রাত্রি ৯ টার সময় কলকাতার ৮ নং মানিকতলার বাড়িতে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তার সমগ্র ইহজাগতিক কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটিয়ে পরলোকগমন করেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন ঊনবিংশ শতকে জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্ম, জীবনবোধ এবং মনুষ্যত্বের আদর্শে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব। যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ চতুর্দশ শতকে ইউরোপে ঘটেছিল আবার তিনিশ শতকে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল ভারত তথা বাংলায়। এর ফলে জ্ঞান চর্চার যে নব দিগন্তের উন্মোচন ঘটলো তার অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি যে কেবল একজন পুরনো আকর সম্পাদক ও ভাষ্যকার ছিলেন তাই নয়, তাঁর ছিল বিশ্বকোষ সাদৃশ্য জ্ঞান ভান্ডার তিনি একাধারে ছিলেন ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক। বহু পথ পেরিয়ে বিবর্তন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে ইতিহাস চর্চা আজ ক্রমশ বিকাশমান কিন্তু যখন ভারতে তথা বাংলায় ইতিহাস চেতনার প্রায় উষালগ্ন যখন এ কর্মে বিদেশিরা একমাত্র আধার হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তখন প্রথম ভারতীয় ও বাঙালি হিসেবে একর্মে মনোনিবেশ করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ইতিহাস চর্চার প্রথম পর্বে ধারাবাহিকভাবে ভারতের ইতিহাস লেখা সম্ভব ছিল না। কারণ তখন ভারতের অতীত উদ্ধারের প্রথম পর্ব, তখনো ইতিহাসের মজবুত ভিত্তি তৈরি হয়নি। রাজেন্দ্রলাল একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রাচীন আকর গ্রন্থ পাঠ করে সমসাময়িক সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণনা করেন এবং তার প্রামাণ্য হিসেবে নানান শীলা লেখ ও মুদ্রার পাঠোদ্ধার, স্থাপত্য নিদর্শন আবিস্কার ও তার ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে ভারত ইতিহাসের খন্ড চিত্র নির্মাণ করতে থাকেন। অন্যদিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার পদ্ধতি অনুসরণ করে ভারতের

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ঘটিয়ে তথ্যের সত্যতা বিচার করে সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক ইতিহাস লেখার পথ প্রশস্ত করেন। তাঁর ইতিহাস গবেষণার উপর ভিত্তি করে আধুনিক কালে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা প্রাচীন পুরাকীর্তি, ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে নতুন নতুন সত্য অন্বেষণ করেছেন। যদিও একথা সত্য যে রাজেন্দ্রলাল প্রদত্ত অনেক মতামত পরবর্তীকালে গৃহীত হয়নি। তবে ইতিহাসের পাঠক হিসেবে আমাদের একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, ইতিহাস সতত পরিবর্তনশীল এবং ঐতিহাসিক গবেষণা পূর্ববর্তী মতামতের সত্যতা পরীক্ষার মধ্য দিয়েই চিরকাল অগ্রসর হয়েছে। অর্থাৎ, নব আবিষ্কৃত তথ্যের ভিত্তিতে ইতিহাসও তার পুরনো রূপ পরিত্যাগ করে নতুন রূপ গ্রহন করে। সেক্ষেত্রে ইতিহাস বদলে গেলেও ঐতিহাসিকের ভূমিকাকে কখনো অস্বীকার করা যায় না। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে আমরা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মধ্যে রেনেশাঁস যুগের ব্যাপক জ্ঞান-কর্ম যোগের এমন একজন অসাধারণ সাধককে খুঁজে পাই, যিনি তাঁর সারা জীবনের নিরন্তর বিদ্যাচর্চার মধ্য দিয়ে শুধু এশিয়াটিক সোসাইটিতেই নয়, বিশ্বের বহু উন্নত দেশের জ্ঞানীগুণীদের সমাজেই তিনি সমাদৃত হয়েছিলেন। এবং নিজ মহিমায় তিনি এই দেশকেও সারা পৃথিবীর দরবারে সেকালে একটা সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। ভারতীয়দের দ্বারা দেশজ প্রত্ন-নিদর্শন সম্পর্কিত বিদ্যাচর্চার ভিত্তি স্থাপনে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর কঠোর ও নিরলস শ্রম দেশ-বিদেশ থেকে তাঁর জন্য সম্মান বয়ে আনতে শুরু করে। ঔপনিবেশিক যুগে প্রাথমিককালের ভারতীয়দের মধ্যে পান্ডিত্য এবং শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে তিনি ইউরোপে সম্মানিত হন। তিনি ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডের ‘রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি -এর সদস্যপদ লাভ করেন। ভিয়েনা এবং ইতালিতেও তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন। সরকার তাঁকে ১৮৭৭ সালে ‘রায় বাহাদুর’, ১৮৭৮ সালে ‘সি.আই.ই’ এবং ১৮৮৮ সালে ‘রাজা’ উপাধিতে ভূষিত করে। তিনিশ শতকের ভারতের এই অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ মহাপুরুষ রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে আমরা আজ ভুলে গেলেও তাঁর জীবনের কর্ম ও সাধনা ভারতবাসীর কাছে তাঁর কৃতিত্বকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

তথ্যসূত্র

১. অলোক রায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাগর্থ, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ : ৮
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, ১৯৬২, পৃ : ১২৮
৩. প্রবোধচন্দ্র সেন, বাংলার ইতিহাস সাধনা, ১৯৪৩, পৃ : ৩৬০-৩৭২
৪. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের স্ব-হস্তে লিখিত ডাইরি, নোটবুক, পৃ: ২৩২
৫. রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জীবনী, ‘জন্মভূমি’, ১৮৯১, পৃ : ৫৪২
৬. Proceedings of the Asiatic society of Bengal, 4th November, 1846
৭. History of society, centenary review of the A.S.B (প্রথম খণ্ড), পৃ: ৬৫
৮. Proceedings of the Asiatic society of Bengal, December, 1847, পৃ: ১২২৪
৯. তদেব, জানুয়ারি, ১৮৪৮, পৃ : ৭০-৭২
১০. তদেব, ৬ষ্ঠ ভাগ, ১৮৫০, পৃ : ৪৭৫-৪৮০
১১. On the sena rajas of Bengal, J.A.S.B, voll-XXIV, ১৮৫৫, পৃ: ১২৮
১২. Rajendralal mitra, indo-aryans, Voll-II, 1881, পৃ: ২৩২
১৩. On the pala amd sena dynesties of Bengal, indo-aryans, 1881, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২৬১
১৪. Principles of Indian temple architecture, indo-aryans, 1881, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৫৯
১৫. Archeological survey report-III, পৃ: ১৮২-১৮৩
১৬. অলোক রায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাগর্থ, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ : ৬৬
১৭. তদেব, পৃ: ৬৯

১৮. তদেব, পৃ: ৭২
১৯. তদেব, পৃ : ৭৫
২০. তদেব, পৃ : ৭৯